সমকাল

তারিখ 27 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্তি দিতে হবে

সমাজ

কাজী মসিউর রহমান

শিক্ষক, ইংরেজি বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের তিনজন প্রাজ্ঞ শিক্ষকের এক গবেষণার মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে একটি চরম সত্য। অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ, অধ্যাপক আমেনা মহসিন ও অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন পরিচালিত এই যৌথ গবেষণাটির শিরোনাম– 'বাংলাদেশ : ফেসিং চ্যালেঞ্জেস অব র‍্যাডিক্যালাইজেশন অ্যান্ড ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজম'। দেশের গণমানুষের করের পয়সায় পরিচালিত সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নির্মম বাস্তবতা ইশারায় জানিয়ে দিতে চাইছে আমাদের জন্য কী ভীতিকর ভবিষ্যৎ অপেক্ষমাণ। আমরা মাঝে মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষার্থীর চরমপন্থায় জড়িয়ে পড়ার খবর পেতাম। এর পেছনের শর্তগুলোও এতদিন আমরা ধারণা করে নিতাম। কিন্তু আজ গবেষণার মাধ্যমেই এর বেশ খানিকটা সত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

এটি এখন অস্বীকার করার উপায় নেই যে, উগ্রবাদ বা যে কোনো গণস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড অথবা এমনকি ব্যক্তিগত আত্মহত্যার মতো ঘটনাগুলোর পেছনেও শিক্ষার্থীদের মাঝে বিরাজমান গভীর হতাশাই সরাসরি দায়ী; যা উল্লিখিত গবেষণায়ও দেখানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরও এ দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা কেন ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে ক্রমাগত হতাশায় আক্রান্ত হচ্ছে? উত্তরে এক কথায় বলা যায়, গত কয়েক দশকে সমাজের অন্যান্য পরিসরের মতো জনবিশ্ববিদ্যালয়েও গণতান্ত্রিকতা ও মননশীলতা চর্চার সুযোগ নজিরবিহীনভাবে সংকুচিত হয়েছে।

সাধারণত সমাজের অপরাপর গোষ্ঠীর মতো শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনেক উচ্চ প্রত্যাশা রাখে। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে জনবিশ্ববিদ্যালয়গুলো (কমপক্ষে) শিক্ষার্থীদের মাঝে বড় কোনো স্বপ্ন বা বৃহৎ আদর্শ বুনে দিতে সক্ষম হচ্ছে না। বাজারমুখী, ভোগবাদে আচ্ছন্ন, শুধু পরীক্ষা-নির্ভর পড়াশোনাই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র বিরাজমান। সঙ্গে রয়েছে বিশেষায়িত ধারার পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অপরাপর বিষয়ে একেবারে নিরুৎসাহী হয়ে উঠছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চলমান পাঠদান প্রক্রিয়ায় হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস বা সাহিত্যের ব্যাপারে জানার কোনো রকম আগ্রহ তৈরি করতে পারছে না। যেহেতু এই অজস্র মাত্রিক যাপিতজীবনের সামগ্রিকতা হিসাব বিজ্ঞান বা সাহিত্য বা পরিবেশ অধ্যয়ন বা কম্পিউটার প্রকৌশল বা কৃষি প্রযুক্তি অধ্যয়ন দিয়ে আলাদা আলাদা করে ব্যাখ্যা বা অনুধাবন করা যায় না; তাই এই বিশেষায়িত পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে শিক্ষার্থীরা জীবন ও আত্মবিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি দাঁড়ায়।

গত কয়েক বছরে জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের আলোকে বলা যায়– রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক ও পয়সার দাপুটে প্রভাবে সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্তমানে অনিয়ম, দুর্নীতি আর দুর্বৃত্তায়নের অভয়ারণ্যে পরিণত হতে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌগোলিক ও মানসিক এলাকার প্রতি ইঞ্চি ভূমিতে সীমাহীন ভয়ের সংস্কৃতি বিছিয়ে দেওয়ার উদ্যোগও শোনা যায়। মেধাবী শিক্ষার্থীরা যখন এ রকম অনাকাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়, যখন তারা অন্যায্যতার বিরুদ্ধে সংগঠিত বা ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করতে পারে না, তখন হতাশার কোলে আশ্রয় নেওয়াটা তাদের জন্য একরকম 'স্বাভাবিক' হয়ে ওঠে। মনে রাখা দরকার, বৃহত্তর হতাশার আবহকে কাজে লাগিয়েই উগ্রতানির্ভর কর্মসূচিগুলো বিকশিত হয়। তারই নিদর্শন উঠে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই গবেষণায়।

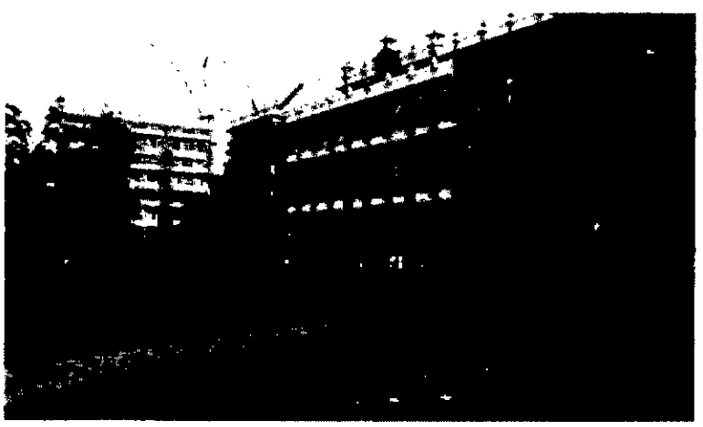

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে মননশীলতা ও বুদ্ধির মুক্তিচর্চার পরিসর নজিরবিহীবভাবে সংকুচিত হয়ে আসছে। কাঠামোগতভাবেই তা করা হচ্ছে। পরীক্ষার ফলকেন্দ্রিক ও শুধু বাজারমুখী পড়াশোনার চাপে কাঙ্ক্ষিত মানবিক গুণাবলি অর্জনের জন্য বিচিত্র বিষয়ে পাঠচক্র, গণতান্ত্রিক তর্ক-আড্ডা, সহশিক্ষা কার্যক্রম, খেলাধুলা, জনঘনিষ্ঠ ছাত্র রাজনীতি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিরন্তরভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এসবের জন্য দরকারি ভৌত পরিসরও হারিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বারা প্ররোচিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নির্বাচন হচ্ছে নিয়মিত অথচ শিক্ষার্থী প্রতিনিধি নির্বাচন দেওয়া হচ্ছে না কয়েক দশক ধরে। এসব ক্ষেত্রে নেই প্রয়োজনীয় বিনিয়োগও। কারণ এ রকম কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি বস্তুগত অর্জনের কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রশ্ন তোলা যায়, শিক্ষার্থীরা মননশীল, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ, বিচক্ষণ ও প্রতিবাদী হয়ে উঠলে অন্যায়কারীদের পথটা আরও কঠিন হয়ে ওঠে বলেই কি এ ধরনের কর্মকাণ্ডে এতটা ঔদাসীন্য দেখানো হয়?

বর্তমানে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা পরিসর থেকে মানবিক বিদ্যাকে প্রান্তে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানবিক বিদ্যায় অধ্যয়নকারী শিক্ষার্থীর সামাজিক পুঁজিও খানিকটা কম। মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা দক্ষ করপোরেট কর্মী, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছে। মানুষ হওয়ার জন্য নয়। রাজধানীর 'খ্যাতিমান' মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে মানবিক বিদ্যা উঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত এ মানসিকতারই প্রতিফলন। আমরা দেখতে পাই, কাঙ্ক্ষিত মানুষ হয়ে উঠতে না পারলে শুধু ভালো প্রকৌশলী, ভালো আমলা, ভালো ব্যবসায়ী ও দক্ষ শিক্ষক ইত্যাদি পেশাজীবীরা মিলে একটি নির্মল ও বাসযোগ্য পৃথিবী বানাতে ব্যর্থ হন। ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্র ও প্রতিবেশ। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধের ৪৬ বছর পরও বাংলাদেশের সামগ্রিক বাস্তবতা তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বলে নেওয়া দরকার, মানবিক বিদ্যা মানুষের মাঝে ইতিবাচক আবেগগুলোর পরিচর্যা করে। সত্যের বহুরূপিতা নির্ণয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে গণতান্ত্রিক ও বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণেও বিশেষ অবদান রাখে।

এত জটিল সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগে, সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে হতাশা সৃষ্টিকারী এই বাস্তবতা থেকে মুক্তি কিসে? উত্তরে বলা যায়, একটি ব্যাপক ও নিবিড় সাংস্কৃতিক পরিবর্তনই মুক্তি আনতে পারে। এ জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পচন ধরলে সমাজের কোণে কোণে ছড়িয়ে যাবে সেই দূষণ। ইতিমধ্যে ছড়িয়ে গেছে অনেকটাই। আর দেশ ও জাতির সামগ্রিক পরিসর আক্রান্ত হলে আপনি যতই ক্ষমতাবান বা সম্পদশালী হোন না কেন, এর ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব আপনাকেও ভোগাবে গভীরভাবে।

তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মননশীলতায় সমৃদ্ধ করতে সৃষ্টিশীল তর্ক-আড্ডা, সহশিক্ষা কার্যক্রম বাড়াতে হবে। তরুণদের সমাজ ও মানুষ ঘনিষ্ঠ করে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালু রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অগ্রাধিকার তালিকায় এগুলোকে যুক্ত করতে হবে। যদিও এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু সেই নির্দেশনা কতখানি বাস্তবায়িত হচ্ছে তার ব্যাপারে তদারকি বাড়াতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে হবে এবং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মুক্তির সঙ্গে সংহতিপূর্ণ সব রকম ভিন্ন মত ধারণ ও প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে।

বিভাগ, অনুষদ ও মননশীল সংগঠনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে সমালোচনামূলক সেমিনার ও বক্তৃতার আয়োজন বাড়াতে হবে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়ায় বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ বা ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ বৃদ্ধির জন্য সামাজিক প্রণোদনা দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষে মানসম্মত প্রশ্ন করাকে উস্কে দিতে শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে।

বলতেই হয়, ক্রমবর্ধমান শিক্ষা ব্যয় অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শিক্ষার্থীকে আরও হতাশ করে তোলে। পড়াশোনা ও চিন্তাচর্চায় মনোযোগ না দিয়ে তারা প্রাইভেট টিউশন ও নানা রকম অর্থ উপার্জনের দিকে ছোটে। দিন শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান শিক্ষার অগ্রগতি থেকে পিছিয়ে পড়ার ফলে তারা এক ধরনের হতাশায় ভুগতে শুরু করে। সুতরাং সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষার বেতন ও অন্যান্য ফি কমাতে হবে। বৃত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। বেতন বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের যে প্ররোচনা তা অগ্রাহ্য করতে হবে। এ রকম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কৃত আপন স্বার্থবিরোধী চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও সরকারকে আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রকৃত বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ না করে সংশ্লিষ্ট এক পক্ষ অন্য পক্ষকে শুধু দোষারোপ করে প্রায় পাঁচ দশকে কোনো লাভ হয়নি। আগামীতেও হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে জাতি গঠনে অবদান না রাখতে পারলে এই ক্ষতি চুইয়ে চুইয়ে ছড়িয়ে যাবে সমাজের সব প্রান্তে। বিদ্যমান উন্নয়নের ধারায় জাতীয় আয় বাড়বে বেশ। আরও ব্যাপক হবে রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্টের নেটওয়ার্ক। প্রযুক্তি-জাদু চোখ ধাঁধাবে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের তিন আকাঙ্ক্ষা ভিত্তিতে ন্যায্যতা-নির্ভর উন্নয়ন সম্ভব হবে না। উগ্রবাদের প্রবাহ বিনাশ করে সমাজে সহনশীলতা, সততা, নিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নান্দনিক জীবনবোধ নিয়ে গড়া সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তা শুরু হতে হবে। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের শিক্ষার্থী আগামী দিনের শিক্ষক, সমাজ নেতা, আমলা, চিকিৎসক, উন্নয়নকর্মী। কমপক্ষে সম্মানের অভিভাবক।

mosiurrahman1971@gmail.com